চিরায়ত

চতুরঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

KOBI PROKASHANI

চতুরঙ্গ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৩০ টাকা

Chaturanga a novel by Rabindranath Tagore
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 230 RS 230 US$ 15
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-02-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ।
‘জ্যাঠামশায়’ ‘শচীশ’ ‘দামিনী’ ও
‘শ্রীবিলাস’ ইহার চারি অংশ।

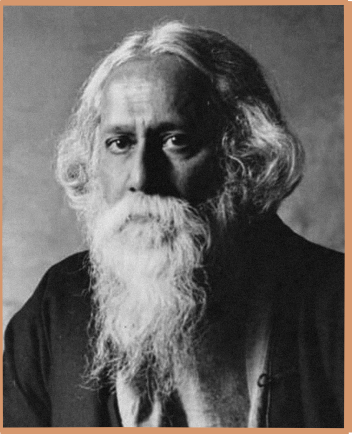

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালির জীবন ও মননের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী ও উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙালির ব্যক্তিত্ব, ভাবনার বিশ্ব আজও ব্যাপ্ত তাঁরই কক্ষপথে। ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠতম পুত্র উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বহুমুখী সৃজনী শক্তিতে হয়ে ওঠেন বাঙালির, বাংলার সাহিত্যের সম্রাট। প্রথম এশীয়, অ-ইউরোপীয় হিসেবে ১৯১৩ সালে জয় করেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। কাব্য, নাটক, গদ্য বা গান—সর্বত্রই তাঁর কিরণ ছিল আলোকবর্তিকার মতো। গড়েছেন লালমাটির দেশে আশ্রম—'বিশ্বভারতী'। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট রবিকবির জীবন অস্তাচলে গেলেও, বাঙালির অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দনে তিনি আজও সত্য, সমকালীন-অনিবার্য।

চতুরঙ্গ

জ্যাঠামশায়

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল, আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম, চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই

বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু, একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরো তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না। তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি তো ভারি অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কী যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কী।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া লাভ কী?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন, মিথ্যাবাদীকে—

শচীশ বাধা দিয়া বলিল, ওরা তো মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে কাজ করিতে পারে না, শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামি কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও বেটার কাঁপুনি-টাপুনি সমস্ত বদমায়েশি!—আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা। তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা-কোনো দামি কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে, সেটাতে আমার অধিকার নাই। আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য?

শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নিচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতি-হিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি, গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনো জন্মে সোনার-বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে! ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্‌ আমাদের কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কলেজে বাঙালি ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা। এইজন্য মিল্টন-শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন; মার্জারজাতীয় চতুষ্পদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রঙ কটা, আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল; সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চারও অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ইশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া;

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই;

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, ঈশ্বর নাই;

অথচ, তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে, ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যাল্‌থস পড়িয়াছিলেন; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোটো ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের এমনি উলটা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই, সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারের বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমনি বিপরীত—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড়ো বয়সে তার আর ব্যামো ছিল না, কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল, সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবি করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এই ভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন, থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয়ভক্তি করিতেন—গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উলটা দিকে। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না, তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা, জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝর্নার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার

জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছল্‌ছল্‌ করিত। তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূরর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তার সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নতুন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাতে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন : মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জানো না, অতএব ওটা বাজে কথা; তার পরে আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয়, কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি; তার পরে শেষ কথা এই যে আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয়-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন-সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি

বলিতেন, বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

৩

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বঁড়শি তখন গলায় বাধিয়াছে, বিঁধিয়াছে; তাই এক পক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন; দাদার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না; মুর্গি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ইহারা এত দূর গিয়াছিলেন যে, মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহাতে না আছে পুণ্য না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্‌শিশের বিজ্ঞাপন বা চোখ-রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী' তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেদের মানিবার জোর বেশি।

‘প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের’ প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উলটা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেশকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর!

হাঁ, আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল, আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভিতু। যেখানে তার আবদার সেখাইে তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না, শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

৪

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী, আচারভ্রষ্ট, এবং সেই কারণে সেবায়েত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন, তিনি দেবদেবী মানেন না; খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না; মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েত-পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে-ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কী?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপে কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাক-ঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কী হে? জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা। দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্‌যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসন-বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়াপরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই, শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায়